ই-বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার

মইন উদ্দীন মাহমুদ

প্রযুক্তি খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রযুক্তির বাজার আসে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে তা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন প্রযুক্তির আসা যত দ্রুত ঘটে তার অবসানও তত দ্রুত ঘটে। পুরনো ব্যবহৃত প্রযুক্তিপণ্য প্রতিস্থাপিত হয় নতুন প্রযুক্তিপণ্য দিয়ে। পুরনো পরিত্যক্ত ও বাতিল ইলেকট্রনিক পণ্য এবং অন্যান্য ই-ওয়েস্ট তথা ই-বর্জ্য অসচেতনভাবে আবর্জনার স্তূপে ফেলা হয় আমাদের চারপাশের কোথাও না কোথাও। এতে যে পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে শুধু তাই নয় বরং স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণও বটে। ই-বর্জ্য পদবাচ্যটি বিশ্বে বহুল পরিচিত। ই-বর্জ্যে পরিণত এসব অ্যাপ-য়েন্সের মধ্যে রয়েছে ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ থেকে শুরু করে কমপিউটার ও মোবাইল কম্পোনেন্ট পর্যন্ত সব কিছুই।

সম্প্রতি জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী এবং জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এক রিপোর্ট পেশ করে বলে, আগামী দশ বছরে শুধু ভারতেই ই-বর্জ্যের পরিমাণ ৫০০ শতাংশ বাড়বে। এই ই-বর্জ্যের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে মোবাইল ফোন হবে উলে-খযোগ্য। এ রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র হলো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় ই-বর্জ্য সৃষ্টিকারী দেশ। শুধু যুক্তরাষ্ট্র বছরে ৩০ লাখ মেট্রিক টন ই-বর্জ্য সৃষ্টি করে। অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় ই-বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্চক্রায়ন সেবা প্রতিষ্ঠান '১৮০০ ই-ওয়েস্ট'-এর মতে, অস্ট্রেলিয়ার গড়পড়তা বাসাবাড়িতে কমপক্ষে ২২ ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য ব্যবহার হয়। এগুলোর আয়ু খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায় শুধু উন্নীত ও নবায়ন করার প্রবণতার ফলে। দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়ার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সংগ্রহ করা বর্জ্য অন্য যেকোনো বর্জ্যের তুলনায় ই-বর্জ্য তিনগুণ বেশি। ই-বর্জ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রয়েছে চীনের অবস্থান। চীন বছরে ২৩ লাখ মেট্রিক টন ই-বর্জ্য সৃষ্টি করে।

চীন, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো শুধু স্থানীয়ভাবে ই-বর্জ্যের মাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে সব ই-বর্জ্য নিয়ে কারবারও করছে। এগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পরিত্যক্ত তথা ডাম্প করা হয়েছে। এসব পরিত্যক্ত ই-বর্জ্য নিয়ে কাজ করতে গেলে কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। কেননা এসব ই-বর্জ্য শুধু পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে তা নয় বরং এসব পণ্য স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

এসব ই-বর্জ্য ধারণ করে বিষাক্ত নানা উপাদান : সীসা, ফসফরাস, পারদ, ক্যাডমিয়াম, গ্যালিয়াম, আর্সেনাইট ইত্যাদি, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলো ছাড়াও পারদ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর, যা মানুষের স্নায়ু ব্যবস্থাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল কমপিউটার, মোবাইল ইত্যাদির বর্জ্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই বলে এগুলোর ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে এমনটি কেউ ভাবছে না। বরং ভাবছে কিভাবে এসব ই-বর্জ্যকে কাজে লাগানো যায় রিসাইকেল বা পুনর্চক্রায়ন করা যায়।

ই-বর্জ্য পুনর্চক্রায়ন

সাধারণত ই-বর্জ্য খুবই অসচেতনভাবে উন্মুক্ত স্থানে আবর্জনার স্তূপে ফেলা হয়। আমাদের দেশে ছেঁড়া কাপড়, কাগজ, ভাঙ্গা-পুরনো জিনিসপত্র সংগ্রহকারীরা বিভিন্ন ধরনের ই-বর্জ্য কুড়িয়ে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে কেউ কেউ ময়লা-আবর্জনার স্তূপ থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন ই-বর্জ্য উপাদান থেকে মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা উদ্ধারের জন্য শক্তিশালী অ্যাসিড ব্যবহার করে থাকে খুবই অসতর্ক ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে। সরকার বা সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি ছাড়াই এ ধরনের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে আমাদের চারপাশে। এ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকেরা প্রতিরোধমূলক কোনো হ্যান্ড গ-াভস বা কোনো মুখোশও ব্যবহার করে না।

এ নিয়ে শ্রমজীবীদের হাত ধরেই গড়ে উঠছে নতুন নতুন ছোটখাটো ব্যবসায়। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে দ্রুতগতিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে গড়ে উঠছে অবৈধ শিল্পস্থাপনা, যা কর্মসংস্থানের সাথে সাথে ই-বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ে অবদান রাখছে। এগুলো রিসাইক্লিং প-ান্ট পুনর্চক্রায়ন কারখানা হিসেবে বিবেচিত। ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং প-ান্টের শ্রমিকেরা নোংরা ও বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করেন, যেখানে তাদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার কথা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়। এসব শ্রমিক ই-বর্জ্য থেকে মূল্যবান ধাতু বের করে বাকি বস্তুগুলো আবার অসতর্কভাবে উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেয়।

ইতোমধ্যে চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ই-বর্জ্যকে রিসাইক্লিংয়ের জন্য বিভিন্ন সংগঠন যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি গড়ে উঠেছে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করে রিসাইক্লিংয়ের জন্য বিভিন্ন শিল্পস্থাপনা। ভারতসহ বাংলাদেশেও ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং কার্যক্রমের ব্যবহার হয় খুবই ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়ায়, যা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কোনো কোনো রিসাইক্লিংয়ের প্রসেসে ক্ষতিকর অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় সার্কিট বোর্ড ভেজানোর জন্য। সার্কিট বোর্ড অ্যাসিডে ডোবানো হয় মূলত সার্কিট বোর্ডের টুকরা অংশ থেকে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করতে। ধাতু সংগ্রহ করার পর এই পরিত্যক্ত বিষাক্ত অ্যাসিডকে উন্মুক্ত নর্দমায় ফেলা হয় কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই। এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ সংঘটিত হয় বাংলাদেশের মতো ভারত, চীনসহ অনুন্নত বিশ্বের অনেক দেশে। ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের শৃঙ্খলাবদ্ধই হলো রিসাইক্লিংয়ের প্রধান কাজ। আশার কথা, অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও খুব সীমিত আকারে প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টর ই-বর্জ্যের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছে। ই-বর্জ্যের সুব্যবস্থাপনার জন্য সচেতনতা বাড়ানোর কার্যক্রমের সাথে সাথে চাই যৌথ পরিচালনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমন্বিত উদ্যোগ।

ভারতের প্রথম এবং একমাত্র এন্ড-টু-এন্ড সমন্বিত ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং প-ান্ট হলো 'অ্যাটেরো রিসাইক্লিং' (Attero Recycling), যা কাজ করে সব ধরনের ই-বর্জ্য নিয়ে। যেখানে সম্পৃক্ত থাকে সব ধরনের বাতিল ও পরিত্যক্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যার আয়ু শেষ হয়ে গেছে এমন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ই-বর্জ্য সংগ্রহ করে তাদের প্রসেসিং প-ান্ট রুরকীতে (Roorkee) নিয়ে আসে, যেখানে ব্যবহারযোগ্য উপাদানের আয়ু সম্প্রসারণ করানো হয়, অন্যান্য সব উপাদানকে রিসাইকেল করা হয় এবং খাঁটি ধাতুকে ব্যবহারোপযোগী করে বিক্রি করা হয়। অ্যাটেরো রিসাইক্লিংয়ের সিওও রোহান গুপ্তা জানান, ই-বর্জ্য থেকে খাঁটি ধাতু বের করে নিয়ে আনার ইউনিক সক্ষমতা তাদের রয়েছে, যা বিশ্বের খুব কম কোম্পানির রয়েছে এ ধরনের কাজের সক্ষমতা। রোহান জানান, এই স্বদেশী স্টেট অব আর্ট টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা গর্ববোধ করেন। অ্যাটেরো রিসাইক্লিং প্রজেক্টে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ প্রসারণ করা হয় সতর্কতার সাথে। এরপর সরকারের অনুমোদিত টিএসডিএফ-এ বাকি ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ফেলা হয়। এরপর উৎপাদিত খাঁটি ধাতু কপার, আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি আবার বাজারে বিক্রি করা হয়। এক্ষেত্রে অ্যাটেরো রিসাইক্লিংয়ে কঠোরভাবে পরিবেশের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এখানে নিয়মিতভাবে পরিবেশগত অডিট হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ISO 14001 এবং OHSAS 18001 সার্টিফায়েড প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশেও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্য নিয়ে কাজ করছে। এদের বেশিরভাগই কমপিউটার মনিটর সংগ্রহ করে টিভিতে রূপান্তর করে। এছাড়া অন্যান্য কম্পোনেন্ট যথাসম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা চালানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্যকে যত্রতত্র না ফেলে আলাদা কক্ষে জমা করে রাখে।

দুঃখের বিষয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশেও ই-বর্জ্য সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার অভাব প্রচণ্ড। সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ এখনও মনে করেন ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এখন লক্ষণীয়, আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ইদানীং বুঝতে পারছে ইলেকট্রনিক পণ্য ধারণ করে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান এবং সেগুলো যেখানে-সেখানে ফেলে না দিয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ রিসাইকেল করা উচিত। যদি পরিত্যক্ত ইলেকট্রনিক পণ্য যথাযথ উপায়ে রিসাইকেল করা না হয়, তাহলে আমাদের চারপাশের পরিবেশ দূষিত হতে

(বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়)

ই-বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

পারে। পানি দূষিত হতে পারে ভারি ধাতু পারদ, সীসা ইত্যাদি দিয়ে। ই-বর্জ্যকে কখনই উন্মুক্ত মাটিতে ফেলা উচিত নয় এবং তেমনি অন্যান্য গৃহস্থালি বর্জ্য ড্রাপ ডিলারদের কাছেও দেয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যারা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ই-বর্জ্য নিয়ে কাজ বা ব্যবসায় করেন।

লক্ষণীয়, ই-বর্জ্য সম্পর্কে যারা কিছুটা ধারণা রাখেন, তারাও হয়তো জানেন না মোবাইল ফোনে অতিমূল্যবান ধাতু সোনা, সিলভার ও প্ল্যাটিনাম ছাড়াও থাকে অন্যান্য ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদান সীসা, জিঙ্ক এবং আর্সেনিক। যখন ফোনসেট উন্মুক্ত ভূমিতে ফেলে দেয়া হয়, তখন তা ভূমি ও পানিকে দূষিত করে। আমাদের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে পরিত্যক্ত ও বাতিল ফোনসেট যেখানে-সেখানে ফেলে দেয়ার হার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এ প্রবণতা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

আমরা যা করতে পারি

ই-বর্জ্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করছে, যা মূলত শুরু হয়েছে আমাদের মাধ্যমেই। সুতরাং আপনার পুরনো পিসি বা মোবাইল ফোন বাতিল করার আগে ভালো করে ভেবে দেখুন। যদি আপনার পিসি তুলনামূলকভাবে ভালো ও কর্মোপযোগী অবস্থায় থাকে, তাহলে সেই কমপিউটার বা ল্যাপটপকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল না করে যাদের দরকার তাদেরকে দান করুন। এ ছাড়া ব্যবহারোপযোগী অথচ বাতিল কমপিউটার সংগ্রহ করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিতে পারেন। এ ধরনের কাজ কমপিউটার জগৎ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং এনজিও-ডিসেট যৌথভাবে করেছে। এক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী কমপিউটারগুলো সরাসরি গ্রামের বিভিন্ন স্কুলে দান করা হয়। যেসব কমপিউটার নষ্ট অথচ মেরামতযোগ্য সেগুলো মেরামত করা হয়েছে। আর যেগুলো সম্পূর্ণ অচল সেগুলোর বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করে অবশিষ্ট অংশ ঝুঁকিমুক্ত করে বাজারে বিক্রি করা হয়। যেমন বাতিল কমপিউটারের হার্ডড্রাইভ সংগ্রহ করে তা ডাটা ব্যাকআপের জন্য সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়া পিসির বিভিন্ন পেরিফেরাল যেমন কীবোর্ড, মাউস, স্পিকার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি যদি মোটামুটি ভালো থাকে তাহলে সেগুলো বিক্রি করে দিতে পারেন। আপনি ইচ্ছে করলে পুরনো ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, এমপিথ্রি, ডিভিডি প্লে-য়ার, টিভি ইত্যাদির পুরনো মার্কেটে বিক্রি করতে পারেন।

কমপিউটিং বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারকারী এইচপি, নোকিয়া, এইচসিএল, স্যামসাং, সনি এরিকসন, উইপ্রো, ডেল এবং আইবিএম ইতোমধ্যে রিসাইক্লিংয়ের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ কোম্পানিগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য কিছু বুথ খুলেছে। এসব বুথে ব্যবহারকারীরা তাদের বাতিল ইলেকট্রনিক কমপিউটার পণ্য দিয়ে যেতে পারেন। বাংলাদেশেও কোনো কোনো আইসিটি পণ্য ব্যবসায়ে ই-বর্জ্য রিসাইকেলের জন্য অনল-বদল প্রকল্প রয়েছে। অবশ্য এই প্রকল্প শুধু মনিটরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে পুরনো মনিটর সংগ্রহ করে এর পিকচার টিউবকে টিভির পিকচার টিউবে পরিণত করা হয়। বাকি উপাদান থেকে বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা করে ব্যবহারোপযোগী করে বিক্রি করা হয়।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com